সংবাদ

0- 075

তারিখ ... ২১।৩।৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

পরীক্ষায় নকলের প্রবণতা

পরীক্ষায় নকল সরবরাহে বাধা দিতে গিয়ে বহিরাগতদের সাথে সৃষ্ট সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পুলিশের গুলীতে মারা গেছেন সাইবান্ধার সাদুল্লাহপুরে একজন গ্রামবাসী, আহত হয়েছেন আরো ১২ জন। এটা নিঃসন্দেহে এক দুঃখজনক ঘটনা। কি অবস্থার্তে পুলিশকে এ ক্ষেত্রে গুলীবর্ষণের মত এক চরম ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হয়েছে সুষ্ঠু তদন্তের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই ঘটনার ভেতর দিয়ে নকলের যে প্রবণতা নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে সেটি খুবই উদ্বেগজনক। একই দিনের পত্রিকায় রয়েছে কুড়িগ্রামের ঘটনা। সেখানে নকল সরবরাহকে কেন্দ্র করে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে আহত হয়েছে ৬ জন ছাত্র ও ৩ জন পুলিশ। নকল করার প্রবণতা আমাদের শিক্ষাজীবনে কোন পর্যায়ে যে পৌঁছেছে তার নমুনা এসব ঘটনা থেকে মিলছে। স্ত্রী পরীক্ষা দিচ্ছেন, স্বামী গেছেন তাকে নকল সরবরাহ করতে। আর তা থেকেই নাকি সাদুল্লাহপুরের সেদিনের দুঃখজনক ঘটনার সূত্রপাত। স্ত্রীর জন্যে স্বামী যে কাজটি সেখানে করতে গিয়েছিলেন সেটিকে আর যাই হোক কোন 'সৎ' কাজ বলে কেউ দাবী করতে পারবে না। অথচ এটাই আজ বলতে গেলে যেন এক রেওয়াজ হয়ে উঠেছে। ছেলের জন্যে বাবাকেও দেখা যায় নকল নিয়ে যেতে। মনে একটু দ্বিধাও আসে না, চিন্তাও হয় না নিজের ছেলে বা কোন আপনজনের জন্যে যে কাজটি করছেন তাতে সত্যি কি তার কোন উপকার হচ্ছে। অভিভাবকই যদি ছাত্রকে নকল করায় উৎসাহ দেয় তবে সে আর শিখবে কি?

সহজে বাজিমাত করার যে প্রবণতা আমাদের সমাজে সাধারণভাবে দেখা দিয়েছে, পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা মূলতঃ সে থেকেই আসছে আগে দেখা যেতো, দু'একটি ছেলে যাদের পড়াশুনা করে পাস করার কোনই ভরসা থাকতো না তারাই শুধু নকলের পথে পা বাড়াতো। এখন এটা তো একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ ভাল করে তলিয়ে দেখা দরকার। কেন পরীক্ষার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নকলের এমন হিড়িক লেগে যায়? এ জন্যে কেবল কি ছাত্ররাই দায়ী, না শিক্ষাপদ্ধতিও দায়ী রয়েছে?

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পড়াশুনায় শৈথিল্য সাধারণভাবেই রয়েছে। সারা বছর পড়াশুনা নিয়মিত না করলে পরীক্ষার সময় নকলের সহজ চিন্তাটাই আসে। শিক্ষাব্যবস্থা এ সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। পরীক্ষার নাম শুনলে আজকাল ছাত্র-ছাত্রীদের মুখ শুকিয়ে যায়, রীতিমত আতঙ্ক দেখা দেয়। পরীক্ষাকে তারা সহজভাবে নিতে পারে না। সারা বছরের শিক্ষা দেয়া-নেয়ার ক্ষেত্রে যেমন থাকছে ত্রুটি, তেমনি ত্রুটি রয়েছে পরীক্ষার পদ্ধতির ক্ষেত্রেও। পরীক্ষায় পাসের পরেও ভবিষ্যৎ চিন্তায় যখন একজন ছাত্রকে উদ্বিগ্ন হতে হয়, ফেলের চিন্তা যে তার মাত্রা আরো অনেক বাড়িয়ে তুলবে তা বলাই বাহুল্য। পরীক্ষায় পাসের হার যতই কমছে, উদ্বেগটা ততই বাড়ছে। শতকরা ১৭ ভাগ পাসের হার দেখে তারিফ কোনটাকেই বা করা যাবে। মূল ব্যবস্থা ও পদ্ধতির ক্ষেত্রেই যদি থাকে ত্রুটি, তবে পরীক্ষা হলে কষে বেঁধেই কি সে সমস্যার সুরাহা মিলবে?

ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে পড়াশুনাকে সারা বছরের নিয়মিত বিষয় হিসেবে নেয় পাঠ্যক্রম সেভাবেই তৈরী করার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে সে শিক্ষা যেন সত্যিকারভাবে কাজে খাটে, পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য সেটাই হতে হবে। তাহলে এক অনিশ্চয়তার ছায়া তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারবে না। আর প্রতিদিনের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যে শিক্ষা অর্জিত হবে তা থেকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে ভয়ের কিছু থাকবে না। পরীক্ষার পদ্ধতিটাও সেভাবেই গড়ে তোলা চাই, যাতে মুখস্থবিদ্যা নয়, ছাত্র-ছাত্রীরা সত্যিকারভাবে কি শিখছে সেটাই বোঝা যায়। পদ্ধতির পরিবর্তনের প্রভাব মানসিকতার ওপর না পড়ে পারে না। এজন্যে যেতে হবে গোড়াতে। নকলবাজকে আস্কারা দেয়ার কোন কারণ নেই। যারা সেটা দেন সেইসব অভিভাবকের ভবিষ্যৎ চিন্তা মাথায় রাখা দরকার। নকল করে যে ছাত্রটি পাস করবে তার আর যাই থাকুক কখনো আত্মবিশ্বাস থাকবে না। বাড়ীতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বত্র এ প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। তা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে। তবে মূল সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে এসব দিয়ে সত্যিকার সমাধান মিলবে না দিনে দিনে এর প্রসারই তার প্রমাণ।